নৃবিজ্ঞান পত্রিকা, সংখ্যা ৭, পৃ: ২১-৩৫
© ২০০২ নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

পাঠ্যক্রম ও জ্ঞান উৎপাদনের রাজনৈতিক বাস্তবতা

মির্জা তাসলিমা সুলতানা*
সাঈদ ফেরদৌস**

১.১. প্রেক্ষাপটঃ

২০০২ সালের মার্চে ঢাকার একটি উন্নয়ন সংস্থা আয়োজিত একটি কর্মশালায়[1] অংশ নিয়েছিলাম। কর্মশালাটির উদ্দেশ্য ছিল টেকসই উন্নয়ন সম্পর্কে শিশু-কিশোর এবং যুবকদের ধারণা (Perception) জানা। ঢাকা শহরের বিভিন্ন নাম করা স্কুলের বাচ্চারা এই আলোচনায় অংশ নেয়। বাচ্চারা টেকসই উন্নয়নের অন্তরায় যেমন কৌশল প্রসঙ্গে যথাযথ এবং চমকপ্রদ উত্তর দিচ্ছিল। এবং তাদেরকে প্রশ্ন করা হয়েছিল 'বাংলার টেকসই উন্নয়ন কিভাবে সম্ভব?' বাচ্চাদের উত্তর ছিল 'কারিগরী শিক্ষা' 'সন্ত্রাস দমন', 'নারীর ক্ষমতায়ন' ইত্যাদির মাধ্যমে 'টেকসই উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব। লক্ষ্যণীয় যে অংশ নেয়া সকল বাচ্চারাই টেকসই উন্নয়ন' এর সাথে পরিচিত; এবং তাদের উত্তরের ভাষা, বাচনভঙ্গী সকলই আমাদের অত্যন্ত পরিচিত 'উন্নয়নেরই' ভাষা। এই বাচ্চারা উন্নয়ন ডিসকোর্সের সাথে এত ভালভাবে পরিচিত হলো কিভাবে? বিভিন্ন মিডিয়ার উপস্থাপন, টকশো সকল- কিছুই নিশ্চয়ই বাচ্চাদের উপর প্রভাব ফেলেছিল। কিন্তু এই সব বাচ্চাদের চিন্তা ও মননে 'উন্নয়ন' প্রসঙ্গটি এমনভাবে ছিল যে, তাকে হঠাৎ শেখা কিংবা খাপছাড়া কোন উপস্থাপন বলে মনে হয়নি বরং বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমও যে এক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে, উন্নয়ন ধারণা যে প্রাতিষ্ঠানিক চর্চায়ও শিখে উঠবার বিষয় সেটাই প্রতীয়মান হয়। 'উন্নয়ন' এর কৌশল, রাজনীতি, উদ্দেশ্য এগুলো এখন বহুল বির্তকিত বিষয়, কিন্তু এ সকল শিশু-কিশোরদের উত্তরে বিতর্কগুলো সম্পর্কে কোন ইঙ্গিত পাওয়া যায়নি, বরং 'উন্নয়ন' এর পক্ষে প্রচলিত যুক্তিগুলোই তারা উল্লেখ করেছিল। তাদের অবস্থাটা নিজেদের স্কুল জীবনের পাঠ্যগুলোর কথা স্মরণ করলেই অনুমান করতে পারি। যেমন আমাদের সময়ে অর্থাৎ ৮০ এর দশকের শুরুর দিকে মাধ্যমিক পর্যায়ে বাংলা বা ইংরেজী রচনার বিষয় ছিল 'সবুজ বিপ্লব', 'খাল কাটা', 'বিজ্ঞানের জয়যাত্রা' ইত্যাদি। পরবর্তী সময়ে 'সবুজ বিপ্লবের' মত 'উন্নয়ন' কর্মসূচীর পরিবেশ বিপর্যয় এবং বৈশ্বিক রাজনৈতিক ভূমিকার যতই সমালোচনা হউক না কেন- দারিদ্র্যের সম্পূর্ণ

* সহকারী অধ্যাপক, নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা
** সহকারী অধ্যাপক, নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

সমাধানের জন্য স্কুল জীবনের ঐ সময়ে "সবুজ বিপ্লবই" ছিল আমাদের কাছে একমাত্র আরাধ্য। স্কুলে আমাদের বিশ্লেষণী শিক্ষার চাইতে অনেক বেশী বিদ্যমান ব্যবস্থার স্বপক্ষে একটি দৃষ্টিভঙ্গী তৈরি হয়েছিল। তাই আমরা মনে করি পাঠ্যসূচীর ভূমিকা আমাদের সমাজ জীবনে নিছক শিক্ষা বিস্তারই নয়- তার চাইতে আরো বেশী কিছু।

শিক্ষা এবং পাঠ্যক্রম হচ্ছে ভীষণভাবে রাজনৈতিক, যদিও শিক্ষার সাথে যুক্ত বা বিযুক্ত লোকজনদের মুখে এই রাজনীতির প্রসঙ্গ উচ্চারিত হয় না- বরং অধিকাংশের কাছেই শিক্ষা 'স্বাভাবিক' 'অনিবার্য' ও 'নিরঙ্কুশ' প্রক্রিয়া এবং 'আলোকদায়ী' প্রকল্প। আমাদের এই লেখায় আমরা শিক্ষা ও পাঠ্যক্রমের ভূমিকা বিশ্লেষণকারী বিবিধ দৃষ্টিভঙ্গীগুলো আলোচনা করবো, তার নিরীখে জ্ঞান রাজনীতির আদলকে ধরবার চেষ্টা করবো এবং বাংলাদেশের প্রসঙ্গে এই আলোচনার তাৎপর্যকে বুঝতে চাইবো।

২.১. শিক্ষা, প্রতিষ্ঠান আর পাঠ্যক্রমকে দেখবার নানা ভঙ্গী

পাঠ্যক্রম কিংবা জ্ঞান ব্যবস্থা নিয়ে যখন আমরা কথা বলি, তখন প্রায়শঃই বিষয়টিকে দেখা হয়ে থাকে 'নিরংকুশ' 'বাস্তবতা' আর 'স্বাভাবিকতার' নিরিখে, আমাদের চারপাশে যখনই শিক্ষা নিয়ে কোনো বিশ্লেষণাত্মক আলোচনার আসর বসে তখন সবার আগে যে যুক্তিটা সামনে চলে আসে সেটা হলো 'শিক্ষাকে জীবন ঘনিষ্ঠ। হতে হবে' এর নানারকম তরজমা করা যায়, বাক্যটা বলা মাত্রই যেটা বেশীর ভাগ মানুষ বুঝে নেন-সেটা হলো শিক্ষা এমন হওয়া দরকার যাতে করে মানুষ তা বিক্রি করে খেতে পারে। স্পষ্টতঃই এটা শিক্ষা দর্শনের একটি দিক হতেই পারে, কিন্তু শিক্ষা দর্শনের অন্য দিকটি হওয়া বাঞ্ছনীয় শিক্ষার মধ্য দিয়ে জ্ঞানের মধ্য দিয়ে নিজেকে সমাজকে বিশ্বকে পাঠ করবার তাগিদ-যেটি আমাদের এখানে বড় 'অচল', বড় 'অবাস্তব 'অপ্রয়োজনীয়' মনে করা হয়। সে কারণেই প্রাথমিক কিংবা মাধ্যমিক পর্যায়ের স্কুল শিক্ষার্থী হতে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী শিক্ষকের কাছেও 'তত্ত্ব' হচ্ছে-বিভীষিকা, অবাস্তব, আর প্রয়োগিক কারিগরী কিংবা কর্মমুখী শিক্ষা হচ্ছে এই অবাস্তবতা থেকে বাস্তব পরিত্রাণ। আর এই কারিগরী কিংবা কর্মমুখী শিক্ষাকে আবার 'উন্নয়নের' গালভরা বুলির সাথে যুক্ত করা হয়।

শিক্ষাকে এরকম রুটি-রুজির উপযোগিতা দিয়ে ব্যাখ্যা যারা করেন তারা স্পষ্টতঃই জ্ঞানতঃ, অজ্ঞানতাবশতঃ ক্রিয়াবাদী কিংবা উদারবাদী দৃষ্টিভঙ্গীকেই ধারন করেন। বলা প্রয়োজন এহেন দৃষ্টিভঙ্গী যারা ধারন করেন তাদের কাজে শিক্ষা, কিংবা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হলো সমাজের চাহিদার যোগানদার, আর এ বিষয়টাকে তারা দেখেন সমালোচনাহীন প্রশ্নাতীত বিষয় হিসেবে। ফলে জ্ঞান রাজনীতি তাদের কাজে উপেক্ষিত থেকে যায়।

২.১.১ শিক্ষা সমাজের প্রয়োজন মেটায় ঃ ক্রিয়াবাদী, উদারবাদী ধারা (স্কেলটন ঃ ১৯৯৭)

খুব সংক্ষেপে এই দুই দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচিতি দেয়া সম্ভব। ক্রিয়াবাদ, ক্রিয়া এবং উপযোগিতা দিয়ে সকল সামাজিক প্রপঞ্চকে ব্যাখ্যা করে। ক্রিয়াবাদী দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী শিক্ষা এমন হওয়া দরকার যা দিয়ে মানুষ কর্ম করে চারটে খেতে পারবে। এই দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী বিদ্যায়তন, সেটা বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা বিদ্যালয় যাই হোক না কেন, তাকেও দেখা হয় ঐ নিরীখেই যে, প্রতিষ্ঠানের কাজ সমাজের চাহিদা অনুযায়ী শ্রমিক-কর্মী যোগান দেয়া। উল্লেখ্য যে, শিক্ষার এই ক্রিয়াবাদী, উপযোগবাদী দিকটি অর্থনৈতিক, রাজনৈতিকভাবে শক্তিশালী দেশগুলোতেই যে কোন প্রতিষ্ঠিত তা নয়; বরং গরীব বলে, আমাদের মতো দেশেও এহেন শিক্ষার পক্ষে নিরন্তর সাফাই গাওয়া হয়। শিক্ষার পাশাপাশি পাঠ্যক্রম কেমন হবে সে প্রশ্নেও তারা উপযুক্ত বিবেচনাকেই সামনে রাখে। এই দৃষ্টিভঙ্গীর দুটো মৌলিক বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করা সম্ভব।

<u>প্রথমতঃ</u> ক্রিয়াবাদ একটা আদর্শ দশা হতে সব কিছুকে ব্যাখ্যা করে-সব কিছুকে স্বাভাবিক হিসেবে উপস্থাপন করে। স্কুলের কাজ শিক্ষা দেয়া, ছাত্র-ছাত্রীর কাজ শেখা এবং সমাজ গঠনে শিক্ষাকে কাজে লাগানো, আর কি শিখবে তা ঠিক করে সমাজ।

<u>দ্বিতীয়তঃ</u> ক্রিয়াবাদ জ্ঞানের অন্তর্নিহিত দর্শন, ক্ষমতা, রাজনীতিকে দেখতে কিংবা ব্যাখ্যা করতে অক্ষম, তার লক্ষ্য উদ্দেশ্য পরিচিতি খুবই সীমায়িত গন্ডির ভেতরেই ধরা পড়ে ক্রিয়াবাদীদের কাজে।

প্রায়ই একই ভাবে উদারবাদ শিক্ষাকে দেখে থাকে, 'স্বাভাবিকতাবাদী' 'স্বতঃসিদ্ধ' (Taken for granted) প্রক্রিয়া হিসেবে শিক্ষক তার দায়িত্ব করবেন ছাত্র তার দায়িত্ব করবেন- দৈনন্দিন উৎপাদন ও পুনরৎপাদনে তারা অংশ নিবেন গৎবাধা চর্চার মধ্যে- স্কুল তাদের কাছে শিখবার প্রতিষ্ঠান মাত্র সামাজিক বিধি অনুযায়ী এখানে যথাযথ শিখবার পরিবেশ থাকে- একটা ধারা তৈরী হয় এবং শিক্ষার্থীরা সেই ধারাটাকেই গ্রহণ করে।

২.১.২ জ্ঞান ক্ষমতার সাথে সংশ্লিষ্ট উত্তরবাদী ধারায় পাঠ্যক্রম

সাম্প্রতিক উত্তরাধুনিক ধারার তাত্ত্বিকরা এই দুটো ধারারই সীমাবদ্ধতা জুৎসই ভাবে সনাক্ত করেন। যদিও তাদের শিক্ষা আলোচনা প্রসঙ্গেও নানাবিধ প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে। তারা 'নিরপেক্ষ', 'বস্তুনিষ্ঠ', 'স্বাভাবিকতাবাদী', 'নিরংকুশ' কোনো দৃষ্টিভঙ্গীতে শিক্ষা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, পাঠ্যক্রম কিংবা তাদের actor দের বাখ্যা না করে বরং জ্ঞান ও রাজনীতির সম্পর্ককে উদঘাটনের চেষ্টা করেন।

এই ধারার দুইজন তাত্ত্বিকের কাজ আমরা এখানে আলোচনা করব। প্রথম জন পিয়েরে বর্দু যার কাজে আমরা দেখি তিনি শিক্ষাকে 'সাংস্কৃতিক পুঁজি' হিসেবে সনাক্ত করে বলেছেন সমাজের সকলের এই পুঁজিতে সমান অধিকার বা সুযোগ থাকে না। অন্যদিকে অপর উত্তরাধুনিক তাত্ত্বিক পপকেভিচ পাঠ্যক্রমকে সামাজিক বিধান হিসাবে সনাক্ত করেন।

২.১.৩ শিক্ষা 'সাংস্কৃতিক পুঁজি': পিয়েরে বর্দু (বর্দুঃ ১৯৮৬)

পিয়েরে বর্দু মার্কসবাদের কেন্দ্রীয় প্রত্যয় 'পুঁজি' ধারণাটিকে ভিন্ন আঙ্গিকে ব্যাখ্যার চেষ্টা করেন, অর্থনৈতিক পুঁজির ধারণার বাইরে সাংস্কৃতিক ও সামাজিক পুঁজির ধারণার প্রস্তাব করেন। তার মতে পুঁজি হচ্ছে সঞ্চিত শ্রম, তার বস্তুগত আদর্শে পুঁজি হচ্ছে বস্তুনিষ্ঠ আর সংশ্লিষ্ট কাঠামোর সাথে থাকা ক্ষমতাও বটে। তিনি শিক্ষাকে 'সাংস্কৃতিক পুঁজি' হিসেবে ব্যাখ্যা করেন। তার মতে এই সাংস্কৃতিক পুঁজির তিন রকম চেহারা বা প্রকাশ রয়েছে; প্রথমতঃ তা ব্যক্তির দেহ মনে দৈনন্দিন আচরণে প্রকাশিত হয় (যাকে আমরা রুচি মনন বলে চিনি) ব্যক্তি তার বাহক, ব্যক্তি সময় বিনিয়োগ করে এই পুঁজি তার আয়ত্বে আনে - কেবল সময় এখানে প্রতিষ্ঠানে ব্যয় করা সময় নয়। বর্দুর মতে ব্যক্তি বুদ্ধিবৃত্তিক বাজার হতে যতদূরে তত বেশী সময় তার বিনিয়োগ করতে হয় (গ্রাম থেকে, মফস্বল হতে আসা তরুন ডিগ্রী ধারী হলো কিনা সেটার চাইতে বড় হচ্ছে সেই পুঁজি ব্যবহারে করতে হয় দক্ষ কিনা তাকে সে দিকেও নজর দিতে হয়)। সম্পৃক্তির প্রক্রিয়ায় বহিঃস্থ সম্পদ হতে ক্রমে এই অর্জন ব্যক্তির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গে পরিণত হয়। বর্দু আরো বলেন 'সাংস্কৃতিক পুঁজির' ব্যবহার অর্থনৈতিক পুঁজি ব্যবহারকারীদের জন্য সমস্যা তৈরী করে কেননা একে মোকাবেলা করতে হলে একটা ন্যূনতম সাংস্কৃতিক যোগ্যতা অর্থশালীর থাকতে হয়। (আমরা নতুন বড় লোককে-তার শিক্ষাহীনতা রুচিহীনতা দিয়ে হেয় করি)। বর্দু সাংস্কৃতিক পুঁজির আরো দুটো রূপকে হাজির করেনঃ ক. বস্তুনিষ্ঠ দশা- সাংস্কৃতিক বস্তু হিসেবে শিক্ষার বিন্যাস- বই লেখালেখি, চিত্র, ভাস্কর- যাতে শিক্ষা থাকে এবং খ. প্রাতিষ্ঠানিককৃত দশা- শিক্ষাগত যোগ্যতা, প্রাতিষ্ঠানিক সনদ, যা ব্যক্তি সত্তার বাইরেও মূল্যবান।

শিক্ষার এই সামগ্রিক আলোচনায় বর্দু কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তও ব্যক্ত করেন যেটা এই লেখায় প্রাসঙ্গিক। যথা-'সাংস্কৃতিক পুঁজির' ধারণা দিয়ে কোন সমাজের বাচ্চাদের বিদ্যাজাগতিক সাফল্য যে 'প্রাকৃতিক' নয় তার নিরীখ করা যায়; ভিন্ন সামাজিক শ্রেণী হতে আসা বাচ্চাদের সাফল্য, তাদের অসম বুদ্ধি বৃত্তিক অর্জন নিতান্তই সামাজিক (বৈষম্যমুলক শিক্ষা এই বৈষম্য তৈরী করে)। বিদ্যাবাজারে পুঁজির বিনিয়োগ ঘটে- আর প্রাথমিক ভাবে এই বিনিয়োগের কাজটা করে পরিবার। তিনি আরো বলেন 'সাংস্কৃতিক পুঁজি' স্বয়ম্ভূ বিশ্ব তৈরীতে ইন্ধন যোগায়- ব্যক্তিদের মধ্যকার সম্পর্কের ক্ষেত্রেও অপরিহার্য হয়ে ওঠে এবং ব্যক্তির ইচ্ছাকে ছাপিয়ে প্রবল ভাবে বিরাজ করে।

স্পষ্টতঃই তার আলোচনাকে অবাস্তব বলে ঠেলে দেয়া কঠিন। বাস্তব উপযোগিতাগুলোকে তিনি বিশ্লেষণের কেন্দ্রে এনেছেন- কিন্তু কোনো ভাবে 'নিরপেক্ষ' 'বস্তুনিষ্ঠ' কোনো 'আদর্শ' দশা হতে তিনি শিক্ষাকে দেখেননি। বরং শিক্ষার সাথে সামাজিক ক্ষমতাকে যুক্ত করেছেন- শিক্ষার রাজনীতিকে উন্মোচন করেছেন।

সাম্প্রতিক বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে আমরা 'সাংস্কৃতিক পুঁজি' ধারণাটাকে প্রয়োগ করে দেখতে পারি।

বাংলাদেশের শিক্ষিত মানুষজন সরকার, এনজিও, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী হরহামেশা এ কথাই বলতে চান, যে শিক্ষা নেই বলেই দেশের এই বেহাল হাল। শিক্ষার সাথে রুচি, নৈতিকতা, আদর্শ, ন্যায়বোধ সকলকেই যুক্ত করা হয় (যেন যে স্কুলে পড়েনি তার এগুলো নেই আর কি) যারা এগুলো অর্জন করেছেন তারা জ্ঞানগর্ভ অবস্থানে এসে অন্যদের একই প্রদীপের আলো আনতে ব্যস্ত হন। শিক্ষিতকে এই যে মহান করে দেখবার তাগিদের মধ্য দিয়েই 'সাংস্কৃতিক পুঁজি' ধারণাটা বাঙময় হয়ে ওঠে। অন্যদিকে হালের বাংলাদেশে শিক্ষার যে বাণিজ্যিকীকরন ঘটেছে, নীচে কিন্ডারগার্টেন ওপরে আইটি, ক্যারিয়ার এক্সিকিউটিভ কোর্স, বিদেশী সার্টিফিকেট, বেসরকারী কিংবা ফিরিঙ্গী[ii] বিশ্ববিদ্যালয়/ প্রতিষ্ঠান- সেখান থেকেও হাড়ে হাড়ে বর্দুর এই কথা সত্য হয়ে ওঠে যে শিক্ষার অর্জন/ সুযোগ সকলের জন্য সমান নয়; শিক্ষা বিনিয়োগেরও বিষয়- শ্রেণী বৈষম্যের সাথে তা ওতোপ্রোতোভাবে যুক্ত।

২.১.৪. পাঠ্যক্রম সামাজিক বিধান মাত্রঃ পপকেভিচ

> *পাঠ্যক্রম হচ্ছে ঐতিহাসিকভাবে পড়ে ওঠা সেই জ্ঞান, যা আমাদের বিশ্ব সম্পর্কে এবং বিশ্বের একজন উৎপাদক সদস্য হিসেবে নিজ সম্পর্কে যুক্তি বিন্যাসের বিধান ও মান তৈরী করে দেয়। পাঠ্যক্রমে 'সত্য বলার' বিধান কেবল আমাদের পরখ আর নিরীখের মাধ্যমে নির্মিত হয় না। পাঠ্যক্রম হচ্ছে একটা জ্ঞানকান্ডীয় কৌশল যা ব্যক্তি কিভাবে কাজ করবে, বলবে, দেখবে, অনুভব করবে নিজেকে এবং পৃথিবীকে তা নির্দেশ করে দেয় তাই এটা সামাজিক বিধান। — (পপকেভিচ, ১৯৯৭)*

পপকেভিচ বলেন পাঠ্যক্রম ঐ ধারণা ব্যবস্থার মধ্য হতে ঐতিহাসিক ভাবে গড়ে ওঠে যে ধারণা ব্যবস্থা স্কুল শিক্ষা আর বিষয়ের যুক্তিকরণ, মান আর প্রত্যয়গত স্বাতন্ত্রের ধাঁচকে গড়ে তোলে। আবার স্কুলের যুক্তি বিন্যাস ব্যবস্থা হচ্ছে ক্ষমতার দ্বারা প্রভাবিত- তাই পাঠ্যক্রমও সে

বিবেচনায় সামাজিক নিয়ম রীতি আর ক্ষমতার প্রভাবের চর্চা। পাঠ্যক্রম নিয়ম আর মান ধারণ করে বলে, তার মাধ্যমে যুক্তি আর ব্যক্তি স্বত্তা নির্মীত হয়, এর ফলে নিয়ম আর মান নিয়ন্ত্রণকারী সামাজিক কৌশলের জন্ম হয়। তিনি আরো বলেন কোন একটা প্রত্যয়ের চশমা দিয়ে কোন বস্তু/বিষয়কে নির্মানের প্রক্রিয়াটা ঐতিহাসিক। নির্মান বলতে তিনি বোঝান নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক যুক্তিবিস্তার নির্দিষ্ট সমাজে বিরাজমান প্রপঞ্চকে যেভাবে প্রভাবিত করে, ব্যাখ্যা করে -তাকে। এই বিষয়টি পাঠ্যক্রম ও জ্ঞানের আলোচনায় খুবই প্রাসঙ্গিক কোন বিষয়টি পাঠ্য হবে স্কুলে- একটা নির্দিষ্ট সময়ে, কোন বিষয়টি গবেষণার উপাত্ত হবে আর কোনটা বাদ যাবে- সবই নির্মিত এবং তা সামাজিক ক্ষমতার সাথে সংশ্লিষ্ট। তার মতে জ্ঞান হলো শৃঙ্খল কৌশল, ভাল/ মন্দ/ নৈতিক/খারাপকে তারা চাপিয়ে দেয় এমন নয় কিন্তু সকল সামাজিক পরিস্থিতি ঐতিহাসিক ভাবে restrained and constrained- এই সিদ্ধান্তটিই স্বীকৃত হয়।

পপকেভিচের আলোচনা হতে একথা স্পষ্ট যে, পাঠাক্রম মোটেই 'নিরপেক্ষ' 'স্বতঃসিদ্ধ' বিষয় নয়, তা সমাজে বিরাজমান রাজনীতিকে ধারণ করে, তার পুনরুৎপাদনেও ভুমিকা রাখে।

২.১.৫ উত্তর বাদীদের সীমানা ডিঙ্গিয়ে

শিক্ষা, পাঠ্যক্রমের রাজনীতি প্রসঙ্গে পপকেভিচের আলোচনা যে কেবল ক্রিয়াবাদী এবং উদারবাদীদেরই সমালোচনা করে তা নয়, তার কাজ সমালোচনামূলক মার্কসীয় এবং নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গীরও সমালোচনা করে। মার্কসবাদ, তার মত তাত্তিকদের বিবেচনায় পশ্চিমা আলোকদায়ী জ্ঞান প্রকল্পেরই অংশ মাত্র;[iii] এই দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী মার্কসবাদ জ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে অনিবার্যতা আরোপ করে, ব্যক্তিকে ব্যবস্থা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, নিষ্ক্রিয় সত্তা হিসেবে উপস্থাপন করে, বিপরীতে পপকেভিচ কিংবা তার সমমনারা ব্যক্তির agency এর উপর জোর দেন । এ প্রসঙ্গে মনে রাখা কর্তব্য যে পপকেভিচের পুরো আলোচনা মিশেল ফুকোর জ্ঞান-ক্ষমতা মডেলের উপর ভিত্তি করে দাঁড় করানো। এই মডেল আমাদের বিবেচনায় ইতিহাসের পথ খুঁজতে যেমন বহুতর সম্ভাবনাকে উদঘাটন করে তেমনি জ্ঞান অন্বেষণকে নানা ভাবে উদ্দেশ্যবিহীন, দিকভ্রান্তও করে ফেলে।[iv] খুব সংক্ষেপে বলতে গেলে

ক) জ্ঞান মাত্রই ক্ষমতা বা পক্ষ সংশ্লিষ্ট একথা থেকে যে ঝুঁকিপূর্ণ সমীকরনে এহেন তত্ত্ব উপনীত হয় তা হলো, শোষকের বা শোষণের জ্ঞান আর শোষক বা শোষণ প্রতিরোধী জ্ঞান তাদের বিবেচনায় এক কাতারে বিচার্য।

খ) ব্যক্তির agency এবং সক্রিয়তা পাঠ করতে গিয়ে ব্যবস্থার প্রাবল্য তাদের বিশ্লেষণ ধরা পড়েনা, কিংবা গৌণ হয়ে পড়ে।

গ) সর্বোপরি শোষক, শোষিত- সকলেই নিছক একেকটি পক্ষ মাত্র হিসেবে বিবেচ্য হলে তাদের রাজনৈতিক অবস্থানকে ফারাক করতে না পারলে, জ্ঞান চর্চার পুরো প্রকল্পটি অর্থহীন বা উদ্দেশ্যহীন হয়ে পড়ে।

সত্য কথা বলতে গেলে এখানেই মার্কসবাদের সাথে Posties[V] তথা উত্তরবাদীদের রাজনৈতিক ভিন্নতা। Posties-রা জ্ঞানের রাজনীতিকে সনাক্ত করবেন পারঙ্গমতার সাথে, তাতে করে জ্ঞান চর্চা মাত্রই হয়ে ওঠে রাজনৈতিক, আর সেখানে তারা কোনো পক্ষেই দাঁড়াবেন না, যা প্রকারান্তরে বিরাজমান ক্ষমতাশালী ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখতেই সহায়তা করে। বিপরীতে মার্ক্সবাদ পক্ষ সংশ্লিষ্টতার মধ্য দিয়ে বৈষম্যের ব্যবস্থার অবসান ঘটাতে আগ্রহী। এ প্রসঙ্গে মার্কসবাদী শিক্ষা বিশ্লেষক পাওলো ফ্রেইরীর শিক্ষা দর্শন প্রসঙ্গটি বিবেচনা করা যায়। তিনি খোলাখুলিভাবে শিক্ষার রাজনৈতিক দায় ও অঙ্গীকারকে সামনে নিয়ে আসেন। শিক্ষাকে মুক্তির হাতিয়ার বলে বিবেচনা করেন। তার শিক্ষা দর্শন যে কোনো ধরণের প্রাক-নিদেষ্টিতা (givenness) ও 'স্বতঃসিদ্ধ' কে চ্যালেঞ্জ করেন যা স্পষ্টতঃই ক্রিয়াবাদী শিক্ষাদর্শনের একেবারে বিপরীত। উপযোগিতাবাদ, ক্রিয়াবাদ যে ধরণের কারিগরি (কিংবা প্রশাসনিক/প্রয়োগিক) শিক্ষাকে মহিমান্বিত করেন, ফ্রেইরি তাকে বলেন 'ব্যাইকিং শিল্প'। তার মতে এহেন শিক্ষায় শিক্ষার্থী মনকে খোলা পাত্র মনে করা হয়-যেখানে তাকে হাতে ধরে কিছু কৌশল শেখানো হবে। শিক্ষার বৈশিষ্ট্যকে ফ্রেইরী প্রত্যাখ্যান করেন; শিক্ষার্থীকে নিস্ক্রিয় গণ্য করবার বিপরীতে মত দেন, (ফ্রেইরী; '৭২)। ফ্রেইরীর জবাবে উত্তরবাদীরা বলেন ফ্রেইরী যেভাবে শিক্ষার্থীদের 'নিস্ক্রিয়' দেখেন- বিষয়টি আসলে তেমন সরল সিধা নয়। অবশ্যই মনে রাখা দরকার ফ্রেইরীর সমালোচনার সাথে উত্তরবাদীদের রাজনৈতিক অবস্থানও যুক্ত, যা প্রকারান্তরে তাদেরকে ক্রিয়াবাদীদের সাথে অভিন্ন লক্ষ্যমুখী করে তোলে। এই একতরফার উত্তরবাদীদের জবাবে তাই মার্কসবাদীরা (অ্যাপল, ১৯৯৯) বলেনঃ

শ্রেণী সকল কিছু ব্যাখ্যা করেণ না (উত্তরবাদীদের ব্যবহার করা) এহেন যুক্তি ক্ষমতাকে উপেক্ষা করার অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। কিংবা সকল ব্যক্তিই তার শ্রেণী অবস্থানের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ আচরণ যে সব সময় করছে, তা তত্ত্বের সাথে মিলে যাবে ব্যাপারটা এমন নয়। কিন্তু তার অর্থ কোনো ভাবেই এই নয় যে সমাজ হতে শ্রেণী উধাও হয়ে গেছে।

কিংবা

-উত্তর কাঠামোবাদের প্রতি আমাদের উচ্ছ্বাস থেকে আমরা ভুলে যেতে পারি, যে কি ভীষণ ক্ষমতাশালী কাঠামোগত গতিময়তার মধ্যে আমরা বাস করছি।

পপকেভিচ কিংবা বর্দু আমাদের জ্ঞানের রাজনীতি বুঝতে উচ্চতর তত্ত্ব[vi] যোগান দেন। কিন্তু সমসাময়িকতা সত্ত্বেও এহেন তত্ত্বের রাজনীতি এবং সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে আমাদের সজাগ থাকা দরকার। বর্দু তার সাংস্কৃতিক পুঁজির ধারণাকে যেভাবে বিস্তৃত করেছেন তা নিয়ে মার্কসবাদীরা কি বলেন তা শোনা যাক।

Apple বলেন বর্দু তার 'পুঁজি' বিষয়ক আলোচনায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভূমিকাকে নিছক 'জ্ঞানের পরিবেশক' হিসেবে এক জায়গায় নিয়ে দাঁড় করিয়েছেন। উপরন্তু তার মতে জ্ঞানার্জনে 'সক্ষম' ছাত্র হচ্ছে সেই, যে তার শ্রেণী, বর্ণ, লিঙ্গীয় অবস্থান হতে প্রাকৃতিক ভাবে (!) সাংস্কৃতিক উপঢৌকন পেয়ে থাকে। অর্থাৎ এই তত্ত্বকে স্বাভাবিকতার দায়ে অভিযুক্ত করা হচ্ছে, পাশাপাশি নির্দিষ্ট ধরনের সাংস্কৃতিক পুঁজি তথা কারিগরী / প্রশাসনিক শিক্ষা উৎপাদনে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকাকে দেখতে এই তত্ত্ব অক্ষম সেটাও স্পষ্ট করা হচ্ছে।

Apple বলছেন, শিল্প খাতে যদি ব্যাপকতর নিয়ন্ত্রণ, প্রযুক্তিগত উদ্যোগের শ্রম বিনিয়োগ ঘটে, যদি তা বাজার, উৎপাদন এবং ভোগের উপর প্রভাব ফেলে তাহলে অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পুঁজির সঞ্চয়ন নিশ্চিত করাটা জরুরী হয়ে পড়বে। আর এই চাহিদা হতেই যেখানে কিনা স্বত্তা ও জ্ঞান উৎপাদিত হয়, সেই বিশ্ববিদ্যালয়ে এর ব্যাপক প্রভাব তৈরী হবে। কাজেই মনে রাখা দরকার বিশ্ববিদ্যালয় মোটেই নিছক জ্ঞান পরিবেশক নয় (যেমনটা বর্দু বলেন), উৎপাদকও বটে। আর সমাজে কখন কোন জ্ঞানটা প্রয়োজনীয়, কোনটা মর্যাদাপূর্ণ তাও ক্ষমতা সম্পর্ক দ্বারা নির্ধারিত হয়।বিশ্ববিদ্যালয় তথা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এই ক্ষমতার সম্পর্কের সাথে নিবিড়ভাবে জড়িত থাকে।

জ্ঞান রাজনীতি এই প্রসঙ্গটিকে এবারে আমরা বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে স্থাপন করবো।

৩.১ বাংলাদেশের জ্ঞান রাজনীতি

বর্তমান সময়ে বাংলাদেশের স্কুল পর্যায়ের শিক্ষা থেকে শুরু করে পরবর্তী পর্যায়ের শিক্ষা পাঠ্যক্রমে 'উন্নয়ন' ধারনাটি ওতোপ্রোতভাবে রয়েছে। এদেশ গরীব দেশ, এদেশের উপযোগী শিক্ষা পাঠ্যক্রম কি হবে সেটা সকল সময় গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয়। প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষা শেষে স্কুলগুলোতে যাতে কারিগরী শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়, তা হলে গরীব মানুষের বাচ্চাদের জীবন জীবিকার জন্য একটা প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা হয়, সেটার প্রয়োজনীয়তার কথা আমরা দেশের উন্নয়ন প্রসঙ্গে বারবারই শুনে আসছি। এখনও এখানে তেমনটা হয়নি তবে আলোচনাগুলোর গুরুত্ব দেখে বোঝা যায় যে, এটা যেকোন সময়েই ঘটতে পারে। কিন্তু বলাই বাহুল্য প্রাথমিক শিক্ষার পর কারিগরী শিক্ষার বিকল্প ধারণা দেশের বিত্তশালীদের সন্তানদের জন্য নয় বরং দরিদ্র শিশুদের জন্য প্রয়োগ করাই

চিন্তা ভাবনা হচ্ছে। এই ক্ষেত্রে কেউীর স্কুলের জ্ঞান প্রসঙ্গে আলোচনাটি প্রাসঙ্গিক, তিনি বলছেন-শ্রমিক শ্রেণীর ছাত্রদের কোন বিষয়ে সহজ ও সাধারন ধারণা দেওয়া হয় এবং বাস্তবতাতেই যুক্ত থাকতে উৎসাহিত করা হয়। অন্যদিকে মধ্যবিত্ত ছাত্রদেরকে জ্ঞানের ক্ষেত্রে জটিল এবং বিমূর্ত ধারণার সাথে পরিচিত করা হয় এবং কর্তৃত্বপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গীকে প্রশ্ন করতে উৎসাহিত করা হয়। শুধু স্কুলের পাঠ্যক্রমের কথাই বা বলি কেন, বিভিন্ন কেরিয়ার কোর্সের ধারণা (যথাঃ NIIT, Aptech ইত্যাদি) এই উপযোগিতার ধারণা থেকেই এসেছে। আর অধুনা আই, টি কে গুরুত্ব দেওয়া কিংবা মেডিক্যাল ডাটা ট্রান্সক্রিপশনের মত চাকুরীর বাজার ধরার জন্যও রাষ্ট্রীয় পর্যায় থেকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে- যে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আমাদের দেশের ভাল ইংরেজী জানা উচ্চ শিক্ষিত ছেলে মেয়েরা চায় চিকিৎসাবিজ্ঞানের ডিগ্রীধারী পর্যন্ত মেডিকেল ডাটা ট্রান্সক্রিপ্ট করবে। পাশ্চাত্যের ডাক্তার এখন রোগীর রোগ লক্ষণ ইত্যাদি পরীক্ষা করে যে বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা দেয় এবং এর যে ব্যবস্থাপত্র দেয় বাণিজ্যিকীকরন ও সময়াভাবে তা বিস্তারিত লেখেনা বরং অডিও রেকর্ডিং এর সাহায্যে সেগুলো রেকর্ড করে ভারত ও আমাদের মত দেশগুলোতে বিভিন্ন কোম্পানীতে ইন্টারনেটের মাধ্যমে পাঠানো হয়। কর্মীদের মাধ্যমে সেগুলো ট্রান্সক্রিপ্ট করে সেটা আবার ২৪ ঘন্টার মধ্যে ইন্টারনেটের মাধ্যমে ঐ উৎস স্থলে ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হয়। অর্থাৎ এক্ষেত্রে ধনী দেশের চিকিৎসকরা বা উচ্চশিক্ষিতরা জটিল সমস্যা গুলোর জ্ঞানতাত্ত্বিক (epestemological) সমাধান দেবে আর আমরা দরিদ্র বলে এখানে বাস্তবতার কাছাকাছি বা যে শিক্ষা জীবিকার জন্য সহজে বিক্রি করা যাবে সেই ধরণের শিক্ষা চালু থাকবে। আমাদের উচ্চশিক্ষিত স্নাতকরা এতে করে কেবল দক্ষ শ্রমিক হয়ে উঠবার সুযোগই পাবে মাত্র।

তর্কের খাতিরে ধরা যেতে পারে কেরিয়ার কোর্সগুলো না হয় শিক্ষার্থীদের জন্য ঐচ্ছিক। যদিও আমরা জানি-জীবিকার প্রস্তুতির জন্য (বাজারে চালু শব্দ হলো grooming) এখন এটা সত্যিকার অর্থে আর ঐচ্ছিক নেই বরং ক্রমশঃ আবশ্যকীয় উপায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু উচ্চ শিক্ষা পাঠ্যক্রমও কি আর উপর্যুক্ত পরিস্থিতির বাইরে থাকতে পেরেছে? পারেনি বলেই তো কিছু জ্ঞানকান্ড (discipline) এখন অন্যান্য গুলোর চাইতে অধিক মর্যাদা সম্পন্ন। যেমন- আমাদের দেশে এখন বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে- দর্শন, সাহিত্য এমন কি পদার্থ বিজ্ঞান বা রসায়ন ও আর ততখানি দামী নয় যেমনটা ব্যবসায় প্রশাসন কিংবা ফলিত পদার্থ বিজ্ঞান বা ফলিত রসায়ন কিংবা কম্পিউটার বিজ্ঞান দামী বিষয় (এটা কেবল আমাদের দেশের জন্যই যে সত্য তা নয়, এ প্রসঙ্গে একটু আগে করা অ্যাপল এর আলোচনাটি লক্ষনীয়)। ফলে সকল জ্ঞান কান্ডেরই একটা ফলিত শাখা বিকাশের সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছে। নৃবিজ্ঞানেও তেমনটা হবে এ আর এমন কি বিষয়? আমরা পেশাগত জীবনে নৃবিজ্ঞান চর্চার সাথে যুক্ত বলে এ পর্যায়ে এই জ্ঞানকান্ডের প্রসঙ্গ ধরে কিছু বলব।

বর্তমান সময়ে ফলিত নৃবিজ্ঞান 'উন্নয়ন' দর্শনের সাথেই যুক্ত, জানি না অন্য, সময় হয়তো বা অন্য, কোন বাস্তব প্রয়োজন ও সমাধানের সাথে ফলিত নৃবিজ্ঞানকে আমাদের চিনতে হবে। এ সময় 'উন্নয়নের' সাথে নৃবিজ্ঞানীরা যুক্ত হবে এটাই স্বতঃসিদ্ধ (taken for granted) অথচ ১৯৬০ এর দশকের শুরুতে (এস্কোবারঃ ১৯৯১) যখন 'উন্নয়ন' প্রশ্নটি আলোচিত হচ্ছিল তখন বোয়াসিয়ান ধারার নৃবিজ্ঞানীদের চ্যালেঞ্জ করেই সেটা হচ্ছিল কারণ বোয়াসিয়রা মনে করেন প্রত্যেক সমাজই পৃথিবীতে অভিযোজনের মাধ্যমে এমন জায়গায় পৌঁছেছে সেটা ঐ সমাজের জন্য শ্রেষ্ঠ এবং এর কোন পরিবর্তনের প্রয়োজন নেই। কিন্তু ২য় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে নৃবিজ্ঞানীরা প্রায়োগিক ক্ষেত্রে 'সংস্কৃতির বিশেষজ্ঞ' হিসাবে 'উন্নয়ন' কর্মের সাথে যুক্ত হতে থাকেন ব্যাপক হারে অর্থাৎ নৃবিজ্ঞানীরা পূর্ববর্তী অবস্থান থেকে সরে আসেন। অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী কেন্দ্রীক উন্নয়নের ধারণা আপাত মার খাওয়ার পর এক্ষেত্রে সামাজিক প্রশ্নটি ১৯৭০ এর শুরুতে যুক্ত হয় এবং সাম্প্রতিক সময়ে সাংস্কৃতিক বিষয় এবং তার মধ্যে স্থানীয় পর্যায়ের উন্নয়নের প্রভাব এবং কর্মসূচীর জন্য স্থানীয় জ্ঞান ব্যবস্থা গুরুত্ব পেতে থাকে। এর ফলে নৃবিজ্ঞানীদের অভূতপূর্ব সুযোগ তৈরি হয়। এরপর দারিদ্র্য কেন্দ্রীক উন্নয়নের ধারণায় আধুনিকায়নকে দারিদ্র্যের সমাধান হিসাবে দেখা হয় এবং দারিদ্র্যের কারণ হিসাবে ঐতিহ্যকে চিহ্নিত করে পরিবর্তনের কথা বলা হয়েছে ফলে নৃবিজ্ঞানীদের কাজের জায়গা তৈরী হয় (এস্কোবার, ১৯৯১)। সমসাময়িককালে বাংলাদেশের প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে নৃবিজ্ঞান জ্ঞানকান্ডের প্রতিষ্ঠাকে এমন একটা প্রেক্ষিতের সাথে সম্পর্কিত করে দেখা যেতে পারে। ফলে এখানে পাঠ্যসূচীতে উন্নয়ন তথা ফলিত নৃবিজ্ঞান যে বিশেষ জায়গা পাবে তা বলাই বাহুল্য। বাস্তবিক অর্থেও সেই কাজটিই এখানে শুরু হয়েছে। এই দেশে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠিত প্রথম নৃবিজ্ঞান বিভাগটি একযুগ পার করতে না করতেই এখানে ফলিত নৃবিজ্ঞানের একটি প্রকল্প চালু হয়েছে, যার অর্থায়ন করেছে ফোর্ড ফাউন্ডেশন। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে এমন কোনো জ্ঞানকান্ড কি রয়েছে যার কোনো প্রায়োগিক দিক নেই? তবে কেন একটা জ্ঞানকান্ডের চর্চার শুরুতেই এই ছদ্ম বিভাজন তৈরী করা হলো? কার আগ্রহে তা হলো? এই প্রশ্নের সুরাহা খুঁজতেই আমরা পরবর্তী আলোচনায় প্রবেশ করতে পারি।

৩.২ . এদেশের বাস্তবতার ডিসকোর্সঃ

বাংলাদেশের জ্ঞানব্যবস্থার যে চিত্র উপরে আলোচনা করা হলো তার আলোকে আমরা এবারে এই দেশের 'বাস্তবতা' কে পাঠ করতে চাইবো। 'বাস্তবতার'- র প্রসঙ্গটি টেনে আনবার কারণ হলো জ্ঞান ব্যবস্থার চরিত্র আলোচনার ক্ষেত্রে সবসময়ই 'বাস্তবতা'-র দোহাই দেয়া হয়। বাংলাদেশে যারা কারিগরী, প্রশাসনিক কিংবা ফলিত জ্ঞানের ওকালতি করেন তারা এদেশের গরীবি বাস্তবতাকে সামনে

আনেন। নৃবিজ্ঞানী কিংবা সামাজিক বিজ্ঞানীকে আমরা এখানকার দারিদ্র্য চিত্র, চাকুরীর বাজারের সঙ্কটটিকে সামনে আনতে দেখি- ফলিত জ্ঞানের উপযোগিতা প্রশ্নে।[vii]

এখন কথা হলো আমাদের দেশটা গরীব। আর এই গরীবির কিছু তাৎক্ষনিক উপশম হয় দাতা সংস্থার নানা কার্যক্রমে; লোকের চাকুরী হয় বিদেশের ডিগ্রী হয় কিন্তু তাতে করে কি তৃতীয় বিশ্বে দাতাদের রাজনীতি, 'উন্নয়ন' রাজনীতি বৈধ কিংবা নির্দোষ কিংবা মহান হয়ে যায়? কিংবা এহেন 'দাতারা'[viii] এই রকম আপাত যে উপকার করছে, তার মূল্যে অনেক বেশী নিয়ন্ত্রণ আর অনুপ্রবেশের সুযোগ কি তারা পেয়ে বসছে না? কিংবা আরো বড় সত্য কি এই নয় যে, গরীবি বাস্তবতাও 'দাতা' সৃষ্ট, আর তার সমাধানের অজুহাতেই তারা নিজেদের অনিবার্য করে তুলছে?

এই অনুপ্রবেশ এতো শক্তিশালী যে, এদেশের প্রশ্নাতীত বাস্তবতা হয়ে পড়ে 'উন্নয়ন' আর এই বাস্তবতা 'উন্নয়ন' রাজনীতি ক্ষমতা, এসব নিয়ে প্রশ্ন করেনা, প্রশ্ন করাকে পছন্দ ও করেনা। জ্ঞানের বিমূর্তকরণ,ক্ষমতা, তার উৎস বিশ্লেষণ এখানকার নৃবিজ্ঞানীর কাছেও বাস্তবতা বিবর্জিত রিটোরিকাল হওয়া (আলম, ২০০১)।

স্পষ্টতঃই আমরা বাস্তবতায় এহেন বাহ্যিক পাঠকে প্রত্যাখান করি, যেখানে প্রকৃত বাস্তবতার ফলাফল দেখা যায় মাত্র, তার কারণ উপেক্ষিত থেকে যায়। বাস্তবতা তো এই যে,যে জ্ঞান আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াচ্ছি তার উপরে আমাদের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই, তা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে দাতা কিংবা বাজার নামক উর্দ্ধতন ক্ষমতার প্রতিষ্ঠান দ্বারা; এই কথাটাই একটু আগে অ্যাপল কিংবা পপকেভিচের কাজে প্রতিধ্বনিত হতে শুনেছি। পপকেভিচের বরাত দিয়ে বলা যায় আমাদের পাঠ্যক্রম হতে যদি আমরা আমাদের সামাজিক বিধানকে পাঠ করতে চাই, তা হলেই দেখতে পাবো আমাদের সমাজ, পরিবার কিংবা ব্যক্তির পছন্দ কি সাংঘাতিক রকম অধিপতি পুঁজিবাদী ব্যবস্থা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। ব্যক্তি কেন দর্শন, সাহিত্য পড়তে অনাগ্রহী? কারণ সে জানে এটা পড়ে চাকুরী হবেনা, পরিবারও এটা পড়তে তাকে উৎসাহ দেবেনা, সমাজেও এটা পাঠ্যবিষয় হিসেবে মর্যাদাজনক নয়। সুতরাং ব্যক্তির পাঠ্যবিষয় বাছাই আদতে তার বাছাই নয়, ব্যবস্থা তার জন্য যা বাছাই করে দিচ্ছে, তাই সে পড়তে বাধ্য। এটা চাকুরীর কিংবা ক্যারিয়ারের ক্ষেত্রেও সমান সত্য। এখন কথা হচ্ছে অনেকেই এই বিন্দুতে এসে এটাকেই বাস্তবতা হিসেবে মেনে নিতে চান, আর আমরা এই বাস্তবতা যেভাবে অনিবার্য হয়ে ওঠে তা নিয়ে প্রশ্ন তোলারই পক্ষপাতী।

আমাদের তোলা প্রশ্ন হতে আমরা এই রকম ইউটোপীয় সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে চাইনা যে সামাজিক বিজ্ঞানের স্নাতকের এনজিও তে কাজ করার অর্থ হচ্ছে যে সে

সাম্রাজ্যবাদের লোক হয়ে গেলো। কেননা এটা স্পষ্ট যে, যে একটা উপায়হীন বাস্তবতা হতে তাকে কাজটি করতে হয়েছে বা হচ্ছে। কিন্তু আমরা এটা বলতে চাই যে কিছু লোককে চাকুরী দেবার মধ্য দিয়ে এনজিও তার সাম্রাজ্যবাদী যোগাযোগের দায় হতে অব্যাহতি পেতে পারেন। আমরা বলতে চাই যে উপায়হীন বাস্তবতায় আমরা বাস করি তা স্বাভাবিক কিছু নয়, তা নির্মিত আর এই নির্মাণকে নিয়ে প্রশ্ন তোলাটা জরুরী। যে ব্যবস্থা আমাদের গরীব করে রেখেছে, সেই ব্যবস্থাই এই উপায়হীনতা তৈরী করেছে। সেই ব্যবস্থাই সমালোচনামূলক, বিশ্লেষণী পড়াশুনার বদলে কারিগরী, প্রশাসনিক, ফলিত পড়াশুনাকে অনিবার্য করে তুলেছে এবং তুলছে।

সে কারণেই আমরা জ্ঞান ব্যবস্থার রাজনীতি নিয়ে প্রশ্ন করি। কারিগরী, প্রশাসনিক, ফলিত এসবকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা বাজারী হৈচৈ নিয়ে প্রশ্ন করি। আমরা মনে করি একটা গরীব দেশে বিকাশমান একটা জ্ঞানকান্ডের মাঝে পয়সা ঢেলে ফলিত-এর বিভাজন আর গুরুত্ব তৈরী করার অর্থ সমালোচনামূলক,বিশ্লেষণী পড়াশুনাকে নিরুৎসাহিত করা ছাড়া কিছু নয়। একই রকম অভিযোগ সত্য কারিগরী আর প্রশাসনিক প্রশিক্ষণের পসরা নিয়ে বসা বেসরকারী ফিরিঙ্গি প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যক্রমের ক্ষেত্রেও।

এই বাস্তবতার ডিসকোর্সকে ভিন্নভাবে দেখতে এ প্রসঙ্গে স্ট্যাভেনহ্যাগেনের আলোচনা স্মরণযোগ্য, যিনি 'উন্নয়ন' রাজনীতির বাইরে ও ফলিত নৃবিজ্ঞানের ক্ষেত্র আবিস্কারের কথা বলেন, প্রায়োগিকতাকে দাতামূখী না করে নিজ সমাজমুখী করার কথা বলেন। তার মতে একদিকে উপনিবেশবাদ এবং সাম্রাজ্যবাদের সাথে আধিপত্য এবং শোষণের ঐতিহাসিক সম্পর্ক রয়েছে অন্য দিকে সাম্রাজ্য ব্যবস্থাপনায় সমাজবিজ্ঞান কে ব্যবহার করা হয়েছে এবং বর্তমান সময় পর্যন্ত সমাজ বিজ্ঞানের এই ভূমিকা অব্যাহত আছে (স্ট্যাভেনহগেনঃ ১৯৮১)। নৃবিজ্ঞানের সাথে তো এই ভূমিকার গভীর সম্পর্ক রয়েছে কিন্ত সমাজ বিজ্ঞান তথা নৃবিজ্ঞানের ভুমিকাকে কি ডিকোলোনাইজ করা যায় না? কৃষকের উপর লেখা বই কৃষকের কাজে আসবে, কৃষক সংগঠনের ভূমিকা নির্ধারনে সাহায্য করবে কিংবা অভিবাসিদের নিয়ে গবেষণা শ্রমিক ইউনিয়ন বা তাদের সমস্যা সমাধানের সাহায্য করবে অথবা সামাজিক আন্দোলন নিয়ে গবেষণা সামাজিক আন্দোলনের গতি, প্রকৃতি, কৌশল নির্ধারণে সহায়তা করতে পারে- নৃবৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রয়োগিকতাকে কি আমরা সেই জায়গাতে দেখতে পারি না ? (স্ট্যাভেনহ্যাগেনঃ ১৯৮১)।

তা করতে হলে সমাজবিজ্ঞান ও নৃবিজ্ঞানের কাজকে সমগ্র ব্যবস্থার মধ্যে নিপীড়ন, শোষণ ও বঞ্চনা কিভাবে ক্রিয়াশীল থাকে সেটা পাঠ করতে হবে।প্রথাগত উন্নয়ন মার্কা ফলিত গবেষণার দৃষ্টিভঙ্গী ঔপনিবেশিক, যা নিপীড়িতকে বাইরে থেকে পাঠ করে। কিন্তু সমগ্র ব্যবস্থার মধ্যে সে যেভাবে নিপীড়ন বঞ্চনার শিকার হয় সেটাকে এড়িয়ে যাওয়া হয়। তাই স্ট্যাভেনহ্যাগেন

গবেষণাকে ডিকোলোনাইজ এবং একই সাথে ডিমিস্টিফেকেশনের কথা বলেন (স্ট্যাভেনহ্যাগেনঃ ১৯৮১)।

৪. সমাপ্তি

পরিশেষে দুটো সাদামাটা তথ্য দিয়ে লেখাটা শেষ করতে চাই।

প্রথমটা মূলতঃ তাদের উদ্দেশ্যে বলা, যারা তৃতীয় বিশ্বের ঔপনিবেশিক দখলকৃত ভূখন্ডে বসে জ্ঞান চর্চার রাজনীতি নিয়ে বিপর্যস্ত। কেবল উন্নয়ন রাজনীতির ছাতার তলায় আছি বলে আমাদেরই যে কারিগরী আর প্রশাসনিক আর প্রায়োগিক 'চোথা' গিলতে হয় তা নয় মনে রাখা দরকার পুরো পৃথিবীটাই পুঁজিবাদী; আর সব খানেই সৃজনশীল, মানবিক, সমালোচনা মূলক পড়াশোনাকে গুটিয়ে কোনঠাসা করেন ক্ষমতাবান মানুষ জনেরা শিল্প সমাজে যোগান দিতে যেমন কর্মী চাই কেবল তেমন কর্মী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছাঁচে ঢালাই করে বের করে দিক -এটা ইউরোপ আমেরিকার সমাজেও কাঙ্খিত; সে কারণে অনেক বিভাগ অনেক পড়াশুনা বন্ধ হয়ে যাবার নজীর ও আছে ভূরি ভূরি (অ্যাপল, ১৯৯৯)। কাজেই ভুক্ত ভোগী নিছকই আমরা নই। তবে এটাও স্পষ্ট সর্বত্রই, এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সোচ্চার লেখালেখি পড়াশুনাও হচ্ছে, হয়। আমরা ও তাই করছি।

দ্বিতীয়টা মূলতঃ বলছি তাদেরকে যারা কারিগরী শিক্ষাকে অত্যাবশ্যকীয় করে দেখেন, এটা মূলতঃ ইতিহাস হতে নেয় একটা তথ্য। ইতালীয় স্বৈরশাসক মুসোলিনীর আমলের শিক্ষামন্ত্রী শিক্ষা সংস্কারের উদ্যোগ নেন এবং active education ,educativity এসব ধারণা চালু করার কথা বলেন। যেমনটি আমাদের দেশে applied, vocational ক্ষেত্রে এখনও বলা হয়। যেমনটি ম্যালিনস্কী Practical Anthropology তে বলেছিলেন। যে নিরীহ প্রশ্নটি এখানে করতে ইচ্ছা হয়, তাহলো ভিন্ন ভিন্ন সময়ের ভিন্ন ভিন্ন প্রেক্ষিতের মানুষজনের এহেন একই রকমের আগ্রহের মাঝে কি কোন যোগসূত্র রয়েছে? প্রসঙ্গতঃ মনে রাখা দরকার যে, মুসোলিনীর পেয়াদার এই সব গালভরা বুলিকে আক্রমন করেই গ্রামবাসীর শিক্ষা আলোচনা দাঁড়িয়েছিল (হোর ও স্মিথ, ১৯৯৬)।

টীকাঃ

---

i বাংলাদেশ উন্নয়ন পরিষদ আয়োজিত কর্মশালাটির শিরোনাম ছিল Children and Youth Perspectives Concerning Sustainable Development in Bangladesh; March 2002.

ii ফিরিঙ্গী বলতে বুঝাচ্ছি ঐসব প্রতিষ্ঠানকে যারা দেশে বসে বিদেশী সনদ বা ডিগ্রী বিতরণ করেন।

iii উত্তরবাদীরা বিবর্তনমূলক ব্যাখ্যাতে অগ্রগতির ধারণাকে সমস্যাজনক বিবেচনা করেন, সে ধারণা অনুযায়ী অ-পশ্চিমা সমাজ সবসময়ই-পাশাপাশি বিবর্তনের

নীচের ধাপের বাসিন্দা, তাদের জ্ঞান কোনভাবেই আলোকদারী 'বিবর্তনের' তূল্য নয়। ফলত: বিবর্তন এবং অগ্রগতির ধারণা মার্কসবাদের বিবেচ্য হওয়ার মার্কসবাদকেও তারা অভিযোগের কাঠগড়ায় দাঁড় করান।

iv এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত লেখার সুযোগ রয়েছে, যা এই লেখায় অবতারণা করতে গেলে প্রসঙ্গান্তর ঘটতে পারে এই আংশকায় বিস্তৃত করা হলো না।

v দেখুন উত্তরবাদীদের প্রসঙ্গে M. W. Apple (1999) এর ব্যবহার Posties এর প্রতিশব্দ হিসেবে উত্তরবাদী ব্যবহার করেছি আমরা। স্টষ্টতঃ যেখানে উত্তরাধুনিকতাবাদী ব্যবহার করা হয়েছে সেখানে postmodernist এর প্রতিশব্দ হিসেবে তা চয়ন করেছি। এপ্রসঙ্গে বিস্তারিত লেখার সুযোগ রয়েছে, যা এই লেখায় অবতারণা করতে গেলে প্রসঙ্গান্তর ঘটতে পারে এই আংশকায় বিস্তৃত করা হলো না।

vi দেখুন M. W. Apple (1999) এর ব্যবহার,স্টষ্টতঃই তিনি ব্যাঙ্গার্থে 'higher theory' ব্যবহার করেন।

vii দেখুন M. W. Apple (1999) এর ব্যবহার,স্পষ্টতঃই তিনি ব্যাঙ্গার্থে 'higher theory' ব্যবহার করেন। এধরণের মতামত অনেকের লেখাতেই প্রতিফলিত হয়। উদাহরণ হিসেবে দেখতে পারেন অধ্যাপক এস, এম, নুরুল আলমের লেখা বাংলাদেশে নৃবিজ্ঞান চর্চায় সাম্প্রতিক বিতর্কঃ কিছু জিজ্ঞাসা ও উত্তর খোঁজার প্রয়াস; লেখাটি একাংশে লেখক বাস্তবতা-র একটি সংজ্ঞা দেবার চেষ্টা করেছে, দেখুন পৃঃ-৭।

viii Donor' বা 'দাতা' প্রত্যয়টি উন্নয়ন ডিসকোর্সে প্রতিষ্ঠিত ও বহুল ব্যবহৃত ধারণা। যদিও উন্নয়নের রাজনীতিতে 'দাতা'-র ইতিবাচক মহানুভব ভাবমূর্তির আড়ালে আপাতঃ অর্থে যারা 'দাতা', প্রকৃত অর্থে তারা 'গ্রহীতা' কিংবা 'ব্যবসাদার' কিংবা 'মুনাফাখোর' এর ভূমিকাই পালন করে। এই ধারণাটি আমরা উদ্ধৃত চিহ্নের মধ্যেই ব্যবহার করেছি-এটা আমাদের পছন্দসই ব্যবহার নয়।

সহায়ক গ্রন্থাবলীঃ

১. আলম, এম, এম নুরুল, বাংলাদেশে নৃবিজ্ঞান চর্চায় সাম্প্রতিক বিতর্ক ঃ কিছু জিজ্ঞাসা উত্তর খোঁজার প্রয়াস, নৃবিজ্ঞান পত্রিকা সংখ্যা-৬, পৃঃ ১-১৮।

২. Michal, Apple, e.w. *What Post Modernists Forget: Cultural Capital and Official Knowledge* in Education, Culture, Economy, Society (eds) A.H. Halsey Hugh Lauder, Phillip Brorwn Amy Stuart Wells 1999; 595-60 4.

৩. Bourdieu, Pierre. *The Forms of Capital* in J.E. Richardson (ed.) Handbook oftheory of research for the sonoldgy of educations Green word Press 1986; 241-58. Translated by Richard Nice.

৪. Escobar, Arturo. *Anthropology and the development encounter: The making and marketing of development Anthropology* in American Ethnologists,1991; 658-681.

৫. Paolo, Freire. Pedagogy of the oppressed, penguine Books, 1972

৬. Gramsci, Antomio. *On Education* in Selections from Prirson Note Books, of Antonio Gramsci Eds. & Translated by Q.Hoare & G.N. Smith, Qrient Longmean 1996: 29-43

৭. Popkewits, Thomas. The Production of reason and power: Curriculum history and intellectual traditions, in Journal of Curricullum Studies. 1997. Vol 29. No. 2. 131-164

৮. Skelton, Alan. *Studying Hidden Curricula: developing a perspective in the light of postmodern insights.* Journal of Curriculam Studies. Vol. 5. No. 2. 1997.

৯. Stavenhagen, Rodolfo. *Decolonizing the Applied Social Sciences* In Between Underdevelopment and revolution, A Latin American Perspective, 1981; 179-203